বাজেট ২০১৬-১৭ উপলক্ষে আমাদের দাবি: বিশ্ব বণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী ২০৩০ এর পর কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধ করা হবে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি

ক্ষুদ্র কৃষককে রক্ষা ও আত্মনির্ভরশীল কৃষি নিশ্চিত করতে সরকার কি প্রস্তুত?

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি:

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও এবং মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫০% (৪৭.৫%) এই খাতে নিয়োজিত থাকলেও দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষির অবদান দিন দিন কমছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৫.৯ শতাংশ (স্থিরমূল্যে)। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ১৬.৫০%, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৬.৭৮%, ২০১১-১২তে এই হার ছিল ১৮.০১%। অথচ ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরে মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৩৩.০৭ ভাগ।

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে যাওয়া দোষের কিছু না হলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় বিষয়টি ভাবনার নিশ্চয়ই। দেশের অর্ধেক শ্রমশক্তি মোট জিডিপি'র প্রায় ৬ ভাগের একভাগ মাত্র অবদান রাখতে পারছে। তাছাড়া বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে এই দেশকে গড়ে তুলতে কৃষিই ছিল সবচাইতে সম্ভাবনাময় খাত।

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা সংকট মোকাবেলায় কৃষির উপর গুরুত্ব যেখানে আমাদের বাড়ানো উচিৎ সেখানে আমরা আরও বেশি পরনির্ভরশীল হয়ে উঠছি। আমরা দিনের পর দিন খাদ্যপণ্য আমদানির দিকে ঝুঁকে পড়ছি, এর ফলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল ও বিপদাপন্ন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি '১৫ পর্যন্ত) মোট খাদ্য আমদানি ছিল ২৮.৪৩ লক্ষ টন, সেখানে এর আগের বছরে একই সময়ে খাদ্য আমদানি ছিল ২৩.৪৪ লক্ষ টন। তার মানে খাদ্য আমদানির হার বাড়ছে। অথচ আমাদের দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমছে প্রতি বছর ১% হারে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিলে খাদ্য ঘাটতি ২০২৫ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ৫০.৩ লাখ টনে। এই খাদ্য ঘাটতি দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন করে তুলবে এবং দারিদ্র বাড়াবে। সুতরাং সত্যিকার অর্থে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করতে কৃষি খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কোনও বিকল্প নেই। এ খাতে তাই চাই পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ।

২. দারিদ্রের বর্তমান চিত্র ও কৃষি

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি পূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসনীয়। কিন্তু দারিদ্র বিমোচন, সবার জন্য পুষ্টি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯২ সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রায়

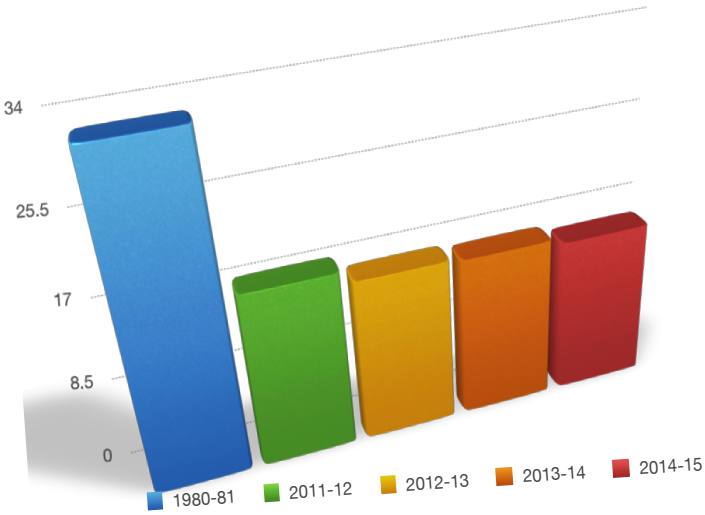

উপরের চার্টে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান কমছে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে যাওয়া দোষের কিছু না হলেও বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় বিষয়টি ভাবনার নিশ্চয়ই।

১৫ মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র সীমার বাইরে নিয়ে আসা গেলেও এখনও প্রায় ৪৭ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। ডব্লিউএফপি'র হিসাব অনুযায়ী এখনও ৫ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে ৪১% শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, ৬ মাস থেকে ৫ বছর শিশুদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ভোগে রক্তশূণ্যতায়, স্কুলগামী ৪০% শিশু ভুগছে প্রয়োজনীয় আয়রনের অভাবে। দেশের এই দারিদ্র বিমোচন ও অপুষ্টি দূরীরকরণে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এই কৃষিতেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মানুষের জীবিকা নির্ভর করে।

৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত: ভর্তুকি প্রত্যাহার হবে আত্মঘাতি, কৃষির জন্য পর্যাপ্ত বাজেট চাই

গত বছর ডিসেম্বরে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১০ম মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় কৃষিতে ভর্তুকির অবসানের ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত হয়েছে। বাংলাদেশও সংস্থাটির সদস্য হিসেবে এই সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধনী দেশগুলো ২০২৩ সালের মধ্যে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এই সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এই চুক্তি বা সিদ্ধান্তে যেহেতু বাংলাদেশও সম্মতি দিয়েছে, তাই বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষিতে ভর্তুকি

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নাইরোবি চুক্তি বাংলাদেশে মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে ধনী দেশগুলোর জন্য চরম চালাকি ছাড়া আর কিছুই নয়। নাইরোবি ঘোষণায় কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল ভর্তুকি বাতিলের কথা বলা হয়েছে। অথচ ২০০৫ সালের হংকং ঘোষণা অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো এক্ষেত্রে ২০১৩ সালের মধ্যেই সকল ভর্তুকি বাতিলের অঙ্গিকার করেছিল, অর্থাৎ নাইরোবিতে এসে তারা সেই সুযোগটাকে আরও ৭ বছর বাড়িয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত করে নিল। আবার এই নিয়ম প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং দুগ্ধ শিল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তার মানে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের এই কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে ঠিকই ভর্তুকি অব্যাহত রাখার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ যেহেতু কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এখনও অনেক পিছনে তাই এই সুযোগ আমরা পাচ্ছি না, অথচ কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভর্তুকী কমিয়ে দিতে হচ্ছে । বাহুল্য সেই প্রভাব নেতিবাচক হতে বাধ্য ।

৩.১ ভর্তুকি বন্ধ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষুদ্র কৃষক, ঝুঁকিতে পড়বে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা:

কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধ করা বা কৃষি রপ্তানিতে সহযোগিতা বন্ধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর কৃষি পণ্যের বাজারে তৈরি করা। বলা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকার কোনও বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিলে অবাধ বণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয়, বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বৈষম্য তৈরি হয়। মুশকিল হলো এই অবাধ বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় আছে বড় অর্থনীতির দেশগুলো এবং অন্য প্রান্তে আছে ছোট দেশগুলো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কখনও বৈষম্যমুক্ত কোনও অবস্থা ছিল না।

উন্নত বা ধনী দেশগুলোর কৃষির সঙ্গে বাংলাদেশের কৃষিকে এক পাল্লায় দেখলে হবে না। উন্নত দেশগুলো ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন কৃষিকে বিরাট আকারের কৃষি ভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কৃষকের সক্ষমতা বেড়েছে, তাদের বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই উন্নত একটি দেশে ভর্তুকি বন্ধ করা আর বাংলাদেশে ভর্তুকি বন্ধ করা এক নয়।

> ২০০৫ সালের হংকং ঘোষণা অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো ২০১৩ সালের মধ্যেই সকল ভর্তুকি বাতিলের অঙ্গিকার করেছিল, কিন্তু নাইরোবিতে এসে তারা সেই সুযোগটাকে আরও ৭ বছর বাড়িয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত করে নিলো

বাংলাদেশের কৃষকরা সাধারণত সার ও ডিজেলের ক্ষেত্রে নগদ ভর্তুকি সহায়তা পেয়ে থাকেন। ২০২৩ সালের পর এই ভর্তুকি দেওয়া যাবে না। ২০৩০ সালের পর বন্ধ করতে হবে কৃষি পণ্যে রপ্তানিতে সহায়ক হয় এমন সকল সরকারি সহযোগিতা। সার ও ডিজেলে ভর্তুকি বন্ধ করলে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, ফলে বাজারে আমাদের কৃষি পণ্যের মূল্য বাড়বে। আবার ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষক বাজারেও তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে না। অন্য দিকে যেহেতু ২০৩০ সালের পর কৃষিপণ্যকে সুরক্ষা দিতে সরকার কিছু করতে পারবে না, তাই উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে কম দামের কৃষি পণ্য আমাদের দেশে ঢুকবে, ফলে ক্রেতারা বাধ্য হয়ে সেগুলো কিনবে। পণ্যের মূল্য না পেয়ে কৃষক উৎপাদনে বিমুখ হয়ে যাবে। বিকল্প আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকলে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র বাড়বে। কৃষি জমি অনাবাদি থাকবে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। ফলে দেশ কৃষি জমি হারাবে অথবা এগুলো প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে চলে যাবে পুঁজিপতিদের কাছে। সামগ্রিকভাবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য তৈরি হবে। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করবে অন্য দেশের খাদ্যের উপর।

৩.২ ধনী দেশগুলো ভুর্তুকি দিয়ে উন্নত করেছে তাদের কৃষি: আমাদের জন্যও এই সুযোগ রাখতে হবে:

বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ধনী দেশগুলোর চাপে বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে যখন তারা শিল্পোন্নত হয়েছে তখনই ভর্তুকি কমানোর দাবি তুলছে। কারণ তারা ভর্তুকি ও সহায়তা দিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলেছে। এখন তাদের প্রয়োজন সেই শিল্পের বাজার। তারা কোনভাবেই চায় না স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাক, এতে করে তাদের বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল এবং এখনো কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপক প্রযুক্তি ও সফলতা নেই, সেহেতু কৃষি কাঁচামালই আমাদের বিক্রি করতে হবে। উন্নত দেশগুলো তাই চায়।

> যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে তার কৃষকদের ৩ লাখ টাকা করে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে, ইউরোপে একজন কৃষক প্রতিদিন ৬ ডলার করে ভর্তুকি পায়। বাংলাদেশের একটি কৃষি পরিবার বার্ষিক বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৯০ ডলারের মতো!

একটি হিসাবে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে তার কৃষকদের ৩ লাখ টাকা করে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে, দেশটি প্রতিদিন ৪০০ মিলিয়ন ডলার কৃষিতে ভর্তুকি দেয়। ইউরোপে একজন কৃষক প্রতিদিন ৬ ডলার করে ভর্তুকি পায়। ২০১০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৫৭ বিলিয়ন

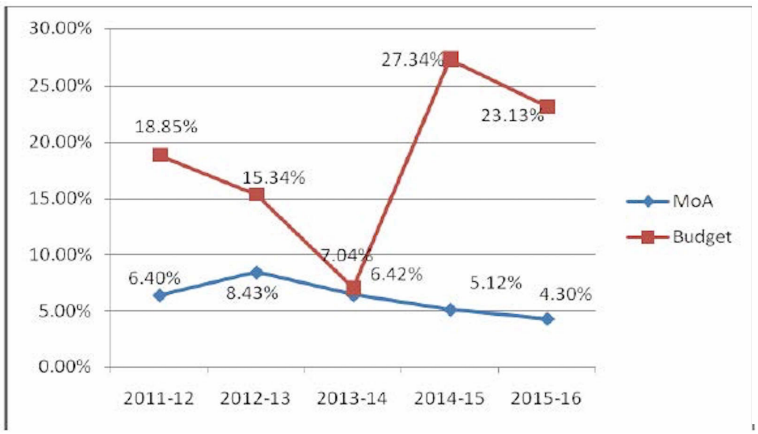

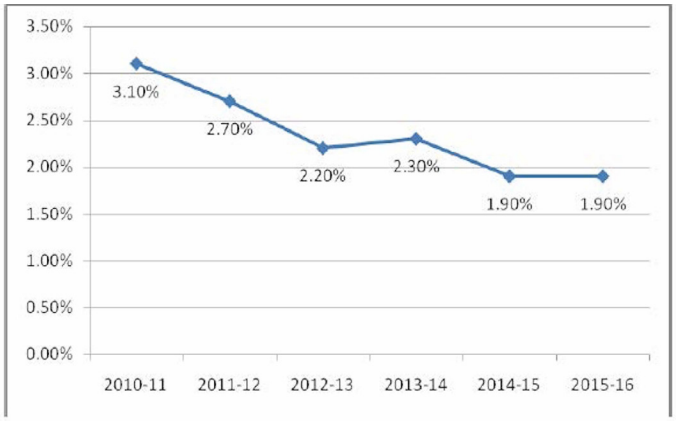

প্রায় প্রতি বছর বাজেটের আকার বাড়লেও কৃষির জন্য বরাদ্দ সেই অনুপাতে বাড়ে না। বামের চার্টে গত কয়েক বছরের মোট বাজেট বৃদ্ধির হার এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বাজেটের বরাদ্দের হার দেখানো হয়েছে। ডানের চার্টে দেখা যায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষির জন্য বরাদ্দের হার নিয়মিতভাবেই কমছে

পাউন্ড কৃষি উন্নয়নে ব্যয় করে, এর মধ্যে ৩৯ বিলিয়ন পাউন্ডই ছিল সরাসরি কৃষি ভর্তুকি। অন্য দিকে গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের একটি কৃষি পরিবার বার্ষিক বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ৯০ ডলারের মতো!

আমরা মনে করি আমাদের কৃষি ও কৃষকের বর্তমান যে অবস্থা তাতে কৃষি খাতে বাংলাদেশকে এখনও নানা ধরনের সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, প্রয়োজন কারিগরি বা প্রযুক্তিগত সহায়তাও।

৪. ২০৩০ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার কি প্রস্তুত: ?

৪.১ কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি জরুরি: আমাদের মনে আছে যে, ২০০৮ সালের দিকে অর্থ নিয়েও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতে হয়েছে বাংলাদেশকে। কৃষি পণ্য যেভাবে বহুজাতিক কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে খাদ্যে র দখল বা মজুদও নিয়ন্ত্রণ করবে কতিপয় দেশ ও কোম্পানি। এর ফলে সংকট হবে ভয়াবহ। এই অবস্থার একমাত্র উপায় খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া এবং কৃষককে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। বাংলাদেশের বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষক যেন ভালভাবে টিকে থাকতে পারে সে জন্য তার দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে করতে হবে। কৃষির যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাজেটে বিবেচনা থাকতে হবে সেগুলো হলো:

কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে: বাংলাদেশ প্রতি বছর মোট কৃষি জমির প্রায় ১% বা ১ লাখ হেক্টর জমি নানা কারণে হারাচ্ছে। বাণিজ্যিক বা উন্নয়নের নামে কৃষি জমি এভাবে হারিয়ে গেল এক সময় কৃষি জমি পাওয়াই কঠিন হয়ে যাবে। কৃষি জমির অকৃষি খাতে ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আইন প্রণয়ন ও তার কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।

সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে: ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে সমবায় কৃষি যে বিপ্লব ঘটাতে পারে তার উদাহরণ ভিয়েতনাম।দেশটি প্রায় সকল কৃষককেই সমবায় কৃষির আওতায় নিয়ে এসে তাদের প্রভূত উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র কৃষককে সমবায়ের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এতে করে তাদের সক্ষমতা বাড়বে, ব্যয় কমবে এবং আয় বাড়বে।

প্রয়োজন কার্যকর বাজার ব্যবস্থা: কৃষি পণ্য ন্যায্য মূল্য কমিশন: দেশের বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। বাজার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, সকল মধ্য স্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম বন্ধ করে ক্রেতা ও উৎপাদকের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে । বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই কৃষি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় ছিল কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। দেশের প্রধান শস্য ধানের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের অর্ধেক মূল্যও ঘরে তুলতে পারেননি সাধারণ কৃষক। ৭০০-৮০০ টাকা খরচ করে প্রতি মণ ধান উৎপাদন করে সেই ধান বিক্রি করতে হয়েছে ৩০০-৪০০ টাকায়। সবজিসহ অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে কৃষকদের অভিজ্ঞতা প্রায় একই। কৃষকদের কৃষি পণ্য ক্রয় বা সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন, কারণ সরকার যেভাবে পণ্য ক্রয় করে তাতে এর সুবিধা কৃষক পায় না, পায় মধ্যস্বত্বভোগীরা। সরকার যখন কৃষি পণ্য সংগ্রহ করে, ততদিনে সেটা কৃষকের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে এগুলোর সুফল আসলে কৃষক পাচ্ছে না। এভাবে সরকার কৃষকের বদলে মধ্যস্বত্বভোগীদের উপকার করে চলেছে। আমরা মনে করি, কৃষক বাঁচাতে এবং কৃষি প্যণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে "জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন" গঠন করতে হবে। এই মূল্য কমিশন কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাজ করবে এবং সরকারি ও বেসরকারি কৃষি পণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনবে।

নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন: দেশের ৬৪টিজেলার মধ্যে প্রায় ৫০টি জেলার ১৫০টি উপজেলার মানুষ নদী ভাঙ্গনের শিকার হয় প্রতি বছর। প্রায় ১০ লাখ মানুষ প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের ফলে বসতবাড়ি, কৃষি জমি ইত্যাদি হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। নদী ভাঙ্গনের করাল গ্রাসে প্রতিবছর এই মানুষগুলোর একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছে। বাজেটে উপকূলের বাধ সংস্কার, নতুন বাধ নির্মাণসহ এ খাতে বিশেষ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রয়োজন: বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘন ঘন ঝড়, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, আকস্মিক বন্যা এবং এর ফলে জলবাদ্ধতা, প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের স্বাভাবিক চাষাবাদ ব্যহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। কৃষককে এই পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে হবে। এই জন্য কৃষককে প্রশিক্ষণ, উপকরণগত সহায়তার জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে বাজেটে।

অর্জন করতে হবে বীজ সার্বভৌমত্ব : কৃষিতে জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড অরগানিজম বা জিএমও ব্যবহার নিয়ে সারা পৃথিবিতেই বিতর্ক আছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এসব ব্যবহারে ক্ষতির প্রমাণ পেয়ে গেছে। অনেক বিতর্ক আর আপত্তি সত্ত্বেও বিটি বেগুনকে এই দেশে অনুমোদন দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিটি বেগুনের অনেক দাবিই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উৎপাদন কম হচ্ছে, পোকা আক্রমণ করছে, যা হবে না বলেই দাবি করা হয়েছিল। মূলত এ প্রযুক্তির নামে কতগুলো কোম্পানি আমাদের কৃষিকে জিম্মি করতে চায়। উন্নত মানের বীজ বলতে যদি বোঝানো হয় উন্নত মানের দেশীয় বীজ, অথবা সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদেশি বীজ, তাহলে সেটা কৃষির জন্য ভাল। বিএডিসিকে এ দায়িত্ব দিতে হবে। উন্নত মানের বীজ সরবরাহের নামে এ খাতটি বেসরকারি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে তা হবে আত্মঘাতী। কারণ, তা শুধু বীজের মূল্যই বাড়াবে না, দেশের পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে জিম্মি করে মুনাফা লুটবে। সব ধরনের ফসল মিলে দেশি বীজের চাহিদা বছরে ১১ লাখ ৫০ হাজার টন। একটা সময় ছিল যখন দেশের মোট বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই করতো সরকার। কিন্তু ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-র চাপে বীজ সরবরাহ ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ করে সরকারের হাত দুর্বল করে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমনকি সরকারও বীজ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষকরা প্রতারিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সরকার ব্যবস্থা নিতে পারেনি। আমরা মনে করি, বিএডিসিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সরকারকে নিজ উদ্যোগেই উন্নত বীজ সরবরাহ, গবেষণা ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

স্থায়িত্বশীল কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ চাই: কৃষকের কাছে স্থায়িত্বশীল ও স্বল্প খরচের প্রযুক্তি পৌছে দিতে হবে। কীটনাশকের বিকল্প নানা পদ্ধতি, সার-সেচের খরচ কমানোর পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে কৃষককে পরিচিত করতে হবে। সরাসরি ভর্তুকি বা রপ্তানিতে সহায়তা না দিলেও কারিগরি সহায়তাটা আরও বিস্তৃত করতে হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে,দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৮৪% কৃষকই কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থার অবসান জরুরি। অন্তত প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো কৃষকের দোরগোরায় পৌঁছে দিতে হবে।

অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ:

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, হাওর কৃষক ও মৎস্য শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), লেবার রিসোর্স সেন্টার, জাতীয় মহিলা কৃষি শ্রমিক ও কৃষক এসোসিয়েশন, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রী, বাংলাদেশ কিষাণী সভা, বাংলাদেশ মৎস্য শ্রমিক জোট ও কোস্ট ট্রাস্ট।

সহযোগিতায়: এমটিসিপি ২ বাংলাদেশ

সচিবালয়:
কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩,
ই মেইল: info@coastbd.org, ওয়েব: www.coastbd.org

participates in survival strategies of coastal poor
COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

MTCP2

যোগাযোগ:
মো. মজিবুল হক মনির, মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir.coastbd@gmail.com
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৩৪৫৫৫৯১, ইমেইল:m.kalamakand@gmail.com